তারিখ - 6 MAY 2017

সংবাদ

ইউজিসি তুমি কার?

জুবায়ের আল মাহমুদ

রাষ্ট্রপতির ১৯৭৩ সালের ১০নং আদেশের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত দেশের সকল সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে সুপরিচিত। সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটিকে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী সংস্থা হিসেবেও আমরা জানি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম প্রতিরোধে বছরজুড়েই এর হাঁকডাক শোনা যায়। তবে প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার মাধ্যমে সুশিক্ষার বিকাশ ঘটানো। কিন্তু সম্প্রতি কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ শিক্ষা দাওরায়ে-ই-হাদিসকে সরকারিভাবে স্নাতকোত্তরের সমান মান দেয়ার স্বীকৃতিতে ইউজিসির ন্যূনতম ভূমিকা রাখার সুযোগ রাখা হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরার আগে ইউজিসির অবদান এবং গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

চলতি বছর সনদ বাণিজ্য, ঢাকার বাইরে একাধিক ক্যাম্পাস, মালিকানা দ্বন্দ্বসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধের ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি ইউজিসিই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। যার ফলে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়েছে। যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধের আদেশ আদালত থেকেই এসেছে। কিন্তু এই আদেশ কখনোই আসত না যদি না ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গবেষণা ও তদন্ত প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রকাশিত না হতো। ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ভুল প্রতিবেদনগুলোর কারণেই দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া ক'বছর আগেও আমরা এক বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক কখনো বা ততোধিক ক্যাম্পাস পরিচালনার দৃশ্য দেখেছি।

আবার বাণিজ্যিক কার্যক্রমের বাইরেও যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে তার পেছনে যে ইউজিসির অবদান রয়েছে সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

কিন্তু সম্প্রতি আবারো প্রশ্ন উঠেছে ইউজিসি গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়ে। ইউজিসি গঠনের মূল উদ্দেশ্য পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার মান রক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানসম্মত শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেবে।

কিন্তু সম্প্রতি সরকারের কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে-ই-হাদিসকে স্বীকৃতি দেয়ার ঘটনা আবারো ইউজিসি গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ সরকারের কোন প্রতিনিধি ছাড়াই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের করা কমিটির অধীনে পরীক্ষা নিয়ে এই সনদ দেয়া হবে। আর সবচেয়ে অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে আমার ধারণা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষগুলোর চাওয়া ণ করতেই সরকার সেখানে প্রতিনিধি রাখেনি। কারণ সরকার কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে এক ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা করেছে। দাওরায়ে-ই-হাদিসকে স্বীকৃতি সেই সমঝোতারই অংশ।

দাওরায়ে-ই-হাদিসকে স্বীকৃতি দেয়ার ঘটনা পর্যালোচনার আগে এখানে কওমি শিক্ষার কিছু ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রচলিত তিন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসাগুলোই মূলত কওমি মাদ্রাসা হিসেবে পরিচিত। তবে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রসার আদলে ১৮০০ সালের শেষের দিকে এ দেশে কওমি মাদ্রাসার গোড়াপত্তন হয়। বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাক-প্রাথমিক স্তর শুরু হয় শিশুর চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে। এই শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর হলো দাওরায়ে-ই-হাদিস। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ড। মারহালাতুত তাকমিল বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির আওতায় দুই বছর মেয়াদি হাদিস ও উলুমুল হাদিস যা দাওরায়ে-ই-হাদিস নামে পরিচিত। এই শ্রেণীর জন্য কওমি মাদ্রাসা বোর্ড বেফাক প্রণীত পাঠ্যতালিকায় রয়েছে : (১). হাদিস: ছহি বুখারি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পূর্ণ। (২). হাদিস: ছহি মুসলিম ও উলুমুল হাদিস দ্বিতীয় খণ্ড পূর্ণ। ছহি মুসলিম প্রথম খণ্ড পূর্ণ। (৩). হাদিস: জামেউত তিরমিযি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পূর্ণ। (৪). হাদিস: শামাইলুত তিরমিযি দ্বিতীয় খণ্ড পূর্ণ। (৫). হাদিস: আবু দাউদ পূর্ণ। (৬). হাদিস: নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ শরীফ পূর্ণ। (৭). হাদিস: আবু দাউদ পূর্ণ। (৮). হাদিস: মুআত্তা ইমাম মালিক ও মুআত্তা ইমাম মোহাম্মদ পূর্ণ। (৯). হাদিস: শরহু মায়ানিল আসার (ত্বহাবী শরীফ) পূর্ণ। (১১). তিলাওয়াত: এই অধ্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়। এতে অকৃতকার্য হলে সনদ দেয়া হয় না।

অন্যদিকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ব্যানবেইসের হিসেবে দেশে ১৩ হাজার ৮২৬টি কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩ লাখ ৮৮ হাজার ৪৬০ জন। এসব শিক্ষার্থীরা যা পড়ছেন বা শিখছে এক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বা তদারকির কোন ধরনের সুযোগ নেই। কওমি শিক্ষার সিলেবাস দেখে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, তাকমীল বা দাওরায়ে-ই-হাদিস স্তরে শিক্ষার্থীরা মূলত হাদিস সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা করে। কিন্তু কওমি শিক্ষার প্রাক-প্রাথমিক কিংবা প্রাথমিকের বিভিন্ন স্তরে কোরআন হাদিস ছাড়াও, একাধিক ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কওমি শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মতে এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হলো ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষায় পারদর্শী হওয়া। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ছাড়াও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলো পড়ানো হলেও দাওরায়ে-ই-হাদিস পর্যায়ে সেগুলো কেন পড়ানো হয় না-এ বিষয়ে কওমি সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। তাদের দাবি জীবনে চলার জন্য যা দরকার তা তারা প্রাথমিক পর্যায়ে অর্জন করে, আর দাওরায়ে-ই-হাদিস পর্যায়ের পড়াশোনা মূলত ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। যা আখিরাতে কাজে লাগবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উক্ত বিষয়গুলো পড়ানো উচিত কিনা কিংবা এখন যা পড়ানো হচ্ছে সেগুলোর পাশাপাশি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে কওমি শিক্ষার্থীদের মূল ধারায় আনা যেত কিনা অথবা কওমি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অর্থে কী পড়ানো হচ্ছে– এমন নানা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারের কোন প্রতিনিধি না থাকায় বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা রাষ্ট্র এবং সরকারের পক্ষে অধরা থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। যেখানে কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে জঙ্গি-সংশ্লিষ্টতার মতো স্পর্শকাতর অভিযোগ রয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে রাষ্ট্রের নিজের নাগরিকদের তারা কি ধরনের শিক্ষা দিয়ে দীক্ষিত করছে তা যদি রাষ্ট্র বা সরকারের কাছে দৃশ্যমান না থাকে, তাহলে দাওরায়ে-ই-হাদিসের স্বীকৃতির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে– এটাই তো স্বাভাবিক।

কওমি সংশ্লিষ্টরা কেন সরকারের তদারকি চাচ্ছে না এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তারা বলেছে, যেহেতু তারা সরকার থেকে কোনরকম অনুদান এবং অর্থ সহায়তা গ্রহণ করেন না, সেহেতু, তদারকির নামে সরকারের কোনরকম নিয়ন্ত্রণও তারা চান না। কওমি শিক্ষার আধুনিকায়ণ বা সংস্কারের প্রশ্নে তারা ওই গণমাধ্যমকে বলেছে, সরকারের কেউ নয় আলেমরাই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

আমার প্রশ্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তো সরকারের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেয় না, কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালগুলোয় কি পড়ানো হয় কিংবা কি পড়ানো হবে, কখন পরীক্ষা নেয়া হবে, পরীক্ষার নিয়ম কি হবে, গবেষণা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে কিনা, ট্রাস্ট্রি বোর্ড আছে কিনা, স্থায়ী ক্যাম্পাস আছে কিনা, পড়াশোনার নামে অন্যকিছু করছে কিনা-এমন নানা বিষয়ে ইউজিসি পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু কওমির দাওরায়ে-ই-হাদিসের স্বীকৃতি প্রদানকারী কমিটিতে রাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধিই থাকবে না– এটা আবার কোন নিয়ম? নাকি এটা নোংরা রাজনীতির কাছে রাষ্ট্রের আত্মসমর্পণ?

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তাদের বিশেষ গুণের কারণে হয়তো কিছু চাকরির সুযোগ পাবে তবে সব জায়গায় বিচরণ করতে হলে কিংবা বিচরণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য তাদেরকে মূল ধারায় আসতেই হবে। মূল ধারার শিক্ষায় যদি তাদের আধুনিকায়ন করা না হয় তাহলে যত সংখ্যক শিক্ষার্থী কওমি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে তারা মসজিদের ইমাম এবং শুধু কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক ছাড়া কোন কিছুই হতে পারবে না। কওমি শিক্ষার্থী এবং এই শিক্ষার সঙ্গে যারা জড়িত তারা আধুনিক শিক্ষা কিংবা মূল ধারার শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। তাহলে তাদের উদ্দেশ্য কী? কেন তারা পিছিয়ে থাকতে চাইছে? তাদের কি আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা নেই? আমার জানতে ইচ্ছে হয়, যেখানে কাওমি মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে ভূরিভূরি জঙ্গি সংশ্লিষ্টাতার অভিযোগ রয়েছে। সেখানে রাষ্ট্র কওমিদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও কাঠামোয় কোন ধরনের তদারকির বিধান না রেখেই স্বীকৃতি দেয়ার মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল! তদারকি তো দূরের কথা, কওমির দাওরায়ে-ই-হাদিস সনদপ্রদানের জন্য আল্লামা শফীর নেতৃত্বে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেখানে সরকারের অসহায় আত্মসমর্পণের কারণে রাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধি রাখার বিধান যুক্ত করা হয়নি।

অর্থাৎ বৈধ ?উপায়ে অবৈধ কাজ করার সুযোগ সেখানে থেকেই যাচ্ছে। কওমি শিক্ষকরা এখন থেকে যদি দাওরায়ে-ই-হাদিসের সিলেবাসের মধ্যে অন্য কিছুও পড়ানো শুরু করে, তবুও দেখার কেউ থাকল না। রাষ্ট্রবিরোধী এমন বিধান কাদের স্বার্থের, কিসের জন্য করা হলো তা মানুষ জানতে চায়।

আমি এখানে স্পষ্ট করে বলতে চাই, দাওরায়ে-ই-হাদিস স্বীকৃতি প্রদানের কমিটিতে যদি রাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধি না থাকে, তাহলে তার জন্য ভবিষ্যতে ওইসব শিক্ষার্থীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ এখানে এখন যেটা হচ্ছে তা শিক্ষার্থীদের স্বার্থের পরিপন্থী। অথচ ইউজিসির সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত করা হলে তাদের সঙ্গে সরকারের সবসময় একটা যোগাযোগ থাকত। যাতে করে তারা এই যোগাযোগের মাধ্যমটি ব্যবহার করে ভবিষ্যতে আরো সুবিধা নিতে পারত। কিন্তু এমন আজব নিয়ম অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে কওমি শিক্ষার্থীরা সনদ ঠিকই অর্জন করবে, কিন্তু তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা ইউজিসি যদি সেই সনদ দিত তাহলে তারা ভবিষ্যতে অনেক জায়গায় সম্মানের সঙ্গে সারাজীবনের কষ্টে অর্জিত এই শিক্ষা সনদ দাখিল করতে পারত। কিন্তু এখন যে সনদের স্বীকৃতি দেয়া হলো সেগুলো ভবিষ্যতে হাস্যকর পত্রে পরিণত হতে পারে। দাওরায়ে-ই-হাদিস সনদ প্রদানের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেখানে অনতিবিলম্বে ইউজিসিকে যুক্ত করতে হবে। তা না হলে ইউজিসি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ ইউজিসি নিশ্চয় শুধু বেসরকারি কিংবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালগুলোর দিকে নজর রাখার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। বরং বাংলাদেশের মাটিতে যারাই উচ্চ শিক্ষা দেবে তারা মানসম্মত শিক্ষা দিচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতেই ইউজিসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবুও দাওরায়ে-ই-হাদিস সনদের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা এই স্বল্প সময়ে যদি ইউজিসিকে দেয়া না হলেও এই সনদ যেন সরকারের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদসহ সবাইকে নিয়ে একটি ভারসাম্য কমিটির মাধ্যমে সনদপ্রাপ্তদের যোগ্যতা যাচাইয়ের কাজটি করতে হবে। পাশাপাশি দাওরায়ে-ই-হাদিসের সিলেবাসে শিক্ষার্থীদের জন্য জাগতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকা সময় উপযোগী এবং তা খুবই জরুরি।

[লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট]
jubaernews24@gmail.com